POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

'তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।' (আলে ইমরান, আয়াত: ৩২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 9
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 28শে ফেব্রুয়ারী, 2019 22 জামাদি আল সানি 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

যে ব্যক্তি খোদাকে ভালবাসে, সে কি জাহান্নামের জীবনে থাকতে পারে? ইহজগতে যেখানে একজন প্রশাসনিক কর্তার মিত্র জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক প্রকার জান্নাতসম জীবন অতিবাহিত করে, তবে সে ক্ষেত্রে যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু তাদের জন্য জান্নাতের দরজা কেনই বা উন্মুক্ত হবে না?

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

যারা মুত্তাকির শরনে আসে তারাও নিরাপদ থাকে

মানুষ বিপদাপদে নিপতিত হয়, কিন্তু মুত্তাকিরা এর থেকে নিরাপদ থাকে। এমনকি যারা তাদের সহচার্যলাভকারীরাও আশ্রয় পায়, তাদেরকেও রক্ষা করা হয়। বিপদাপদের কোন সীমা নেই। মানুষ অভ্যন্তরীণভাবেও কল্পনাতীত বিপদাপদের দুর্বিপাকে আবদ্ধ। বিভিন্ন রোগব্যাধির উদাহরণটিই নেওয়া যাক- এটিই মানুষকে হাজার হাজার সমস্যায় জর্জরিত করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যে ব্যক্তি তাকওয়ার দুর্গে ঠাঁই পায় সে এইসব কিছু থেকে নিরাপদ। আর যে ব্যক্তি এর থেকে বাইরে থাকে সে এমন এক জঙ্গলে আছে যা হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে পরিপূর্ণ।

মুত্তাকি ইহজগতেই সুসংবাদ লাভ করে।

মুত্তাকির জন্য আরও একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ (ইউনুস: ৬৫) অর্থাৎ মুত্তাকিরা ইহজগতেই সত্য-স্বপ্নের দ্বারা সুসংবাদ লাভ করে। এমনকি তারা দিব্য-দর্শনেরও অধিকারী হয়। তারা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে বাক্যালাপের অভিজ্ঞতা লাভ করে। তারা মানুষ হয়েও ফিরিশতাদের দর্শন পায়। যেরূপ বলা হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

(হা-মিম সিজদা: আয়াত: ৩১)

অর্থাৎ পরীক্ষার সময় এমন ব্যক্তি বাস্তবিক নমুনা দ্বারা দেখিয়ে দেয় যে, সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে মৌখিকভাবে কৃত তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।

পরীক্ষা আসা আবশ্যক

পরীক্ষা আসা আবশ্যক। যেরূপ এই আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে-

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (আনকাবুত: ৩) আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা বলেছে আল্লাহ্ আমাদের 'রব' (প্রতিপালক) অতঃপর তারা অবিচলতা প্রদর্শন করেছে, তাদের উপর ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। মুফাসসিরগণ এখানে তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস তুলে ধরেছেন যে, ফেরেশতারা সেই সময় অবতীর্ণ হয় যখন মানুষ মৃত্যুশয্যায় জীবনের শেষ কয়েকটি মূহুর্তের অতিথি থাকে- একথা সঠিক নয়। বস্তুত যারা নিজেদের অন্তরসমূহকে পবিত্র করে এবং কলুষতা থেকে মুক্ত রাখে, যা তাদের ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে, তাদের মাঝে দিব্যবাণী লাভ করার গুণ বিকশিত হয় আর তারা তা লাভও করে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র মুত্তাকিদের মর্যাদার কথা বর্ণনা করে বলেন- اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (ইউনুস, আয়াত: ৬৩) অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ বন্ধু, তাদের কোন দুঃখ নেই। খোদা যার অভিভাবক হন, সে কোন কষ্ট ভোগ করে না। কোন বিরোধিতা তার ক্ষতি করতে পারবে না, যদি খোদা তার বন্ধু হয়ে যান। অতঃপর বলেন- وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (হা-মিম সিজদা, আয়াত: ৩১) অর্থাৎ তুমি সেই জান্নাতের জন্য আনন্দিত হও, যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছে।

কুরআনের শিক্ষা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, মানুষের জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে। যে ব্যক্তি খোদাকে ভালবাসে, সে কি জাহান্নামের জীবনে থাকতে পারে? ইহজগতে যেখানে একজন প্রশাসনিক কর্তার মিত্র জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক প্রকার জান্নাতসম জীবন অতিবাহিত করে, তবে সে ক্ষেত্রে যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু তাদের জন্য জান্নাতের দরজা কেনই বা উন্মুক্ত হবে না? যদিও ইহজগত দুঃখ-কষ্টের সমাহার, কিন্তু আল্লাহ্‌র বন্ধু কোন্ অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করে, সে খবর কে রাখে? এমন সব পরিস্থিতিতে তারা যদি যাতনা অনুভব করত, তবে আধ-ঘন্টার তরেও এমন দুঃখ কষ্ট তাদের জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠত। অথচ তারা সারাটি জীবনই দুঃখ কষ্ট সহন করে চলে। যদি এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতার বিনিময়ে তাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য হতে বিরত থাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়, তবে তারা এমন প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাতও করে না। যদি তাদের উপর দুর্যোগের পাহাড়ও নেমে আসে, তথাপি তারা নিজেদের সংকল্প ত্যাগ করে না।

পরিপূর্ণ নৈতিক আদর্শ

আমাদের পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শককে এই দুটি বিষয়েরই সম্মুখীন হতে হয়েছে। একবার তায়েফে তাঁর উপর পাথর নিক্ষিপ্ত হয়। বিশাল জনতার দল নির্মমভাব তাঁকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তা আঁ হযরত (সা.)-এর অবিচলতায় ফাটল ধরাতে পারে নি। যখন তাঁর স্বজাতি দেখল যে, এই ভয়াবহ যাতনা ও উৎপীড়ন তার উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলছে না, তখন তারা তাঁকে সম্মিলিতভাবে এক সার্বভৌম সম্রাট হওয়ার প্রস্তাব দিল এবং তাদের শাসক হিসেবে গ্রহণ করতে

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

৮ই ডিসেম্বর, ২০১৮

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ (পূর্ববর্তী সংখ্যার পর)

অনুরূপভাবে হযরত আম্মারের মাতা হযরত সুমাইয়া, যিনি একজন বৃদ্ধ মহিলা ছিলেন, ইসলামের প্রতি শত্রুতার কারণে আবু জাহাল তাঁর উরুতে এমনভাবে বল্লম ঢুকিয়ে দেয় যা পেট ভেদ করে বেরিয়ে আসে। যারফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। মোটকথা মুসলমান মহিলাদের আত্মত্যাগের আরও অনেক ঘটনাবলী রয়েছে। এই ঘটনাবলী ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে, যাতে পশ্চাদবর্তীরা নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়। তারা যেন জানতে পারে যে, খোদার কারণে এবং তাঁর ধর্মের মহত্বের উদ্দেশ্যে কুরবানী দিতে হয়। মহিলা ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত কুরবানীর ফলেই জাতি গঠিত হয়। আর এই কুরবানীর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার দ্বীনের মহত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আমরা আহমদীরা এই দৃষ্টিকোণ থেকেও সৌভাগ্যবান যে, ইসলামের পুনর্জীবন লাভের এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। দাবির পর মুসলিম ও অমুসলিম সকলে তাঁর বিরোধীতা করেছে। মুসলমান উলেমারা তাঁর উপর এবং তাঁর জামাতের উপর হত্যার ফতোয়া দেয়। কারণ প্রথমতঃ তিনি নবী হওয়ার দাবি করেন আর অন্যান্য মুসলমানেরা কোনওমতেই তাঁর এই দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি তরবারির জিহাদকে এই যুগের জন্য অপ্রাসঙ্গিক বলে ঘোষণা করেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে একথা ঘোষণা করেন যে, আমার দাবি হল আঁ হযরত (সা.)-এর দাসত্বে শরিয়ত বিহীন নবী হওয়ার। আমি তাঁর দাসত্বে নবী হওয়ার দাবি করেছি, আর সেই নবুয়ত হল শরিয়ত বিহীন। আমি তাঁর শরিয়ত প্রচারের দাবি করেছি এবং ইসলামের শিক্ষাকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করার জন্য দাবি করেছি। মহানবী (সা.) স্বয়ং আগমণকারী মসীহ মওউদ কে নবী নামে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও জিহাদ সম্পর্কিত যে অবধারণা তোমরা উপস্থাপন করে থাক তা এই যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, এই যুগে ইসলামের উপর আক্রমণ হয় বই-পুস্তক - লেখনী এবং অন্যান্য উপায়ে। অতএব, তোমরাও সেই অনুরূপ মাধ্যম অবলম্বন কর এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীর সামনে তুলে ধর। আঁ হযরত (সা.) মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে একথাই বলেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। আর জিহাদ হবে তবলীগ, বই-পুস্তিকা প্রচার এবং প্রচারমাধ্যমের দ্বারা। এই কাজে নারী পুরুষ সকলের অংশগ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু নামধারী উলেমারা একথা মানতে রাজি ছিল না, এই কারণে তারা আহমদীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। আহমদীদেরকে কুরবানী দিতে হয়েছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও তাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করেছে। ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজেদের আবেগ -অনুভুতি ও সন্তানদেরকেও উৎসর্গ করেছে, সম্পদ বিসর্জন দিয়েছে, যাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের যে অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা আমরা লাভ করেছি তা জগতবাসীর কাছে পৌঁছে যায়। পুরুষ ও মহিলাদের সম্মিলিত ত্যাগ-স্বীকারের ফলশ্রুতিতেই আজ পৃথিবীর দুশটিরও বেশি দেশে আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছে গেছে। আজ ইসলাম যদি কোথাও শান্তিপ্রিয় ধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে থাকে, তবে তা একমাত্র আহমদীয়াতের কারণে। অতএব আপনারা যারা আজ এখানে আমার সামনে বসে আছেন, তারা একথাটি স্মরণে রাখবেন যে আপনাদের এখানে আসাও আহমদী পুরুষ ও মহিলাদের ত্যাগস্বীকারের পরিণাম। বিশেষ করে যেসব স্থানে বা দেশে আহমদীদের উপর নির্যাতন হচ্ছে সেখানে আহমদী পুরুষ ও নারী উভয়েই ত্যাগ স্বীকার করেছে। আপনাদের এখানে আসার অর্থ হল মহিলারা ত্যাগ স্বীকার করে ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছেন। ত্যাগস্বীকারের এই ধারা এযাবৎ অব্যাহত রয়েছে। মহিলাদের কিছু এমন ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে যা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। এখন আমি মহিলাদের ত্যাগস্বীকারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব যেগুলি দেখে আমাদের সকলের মনে বিস্ময় জাগে। কেবল পাকিস্তানেই নয়, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দেশে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দান করা এবং ধর্মের কারণে নিজেদের স্বামী ও সন্তান-সন্ততিকেও গুরুত্ব না দেওয়ার একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। নিজেদের জীবন বিসর্জন দেওয়ারও একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন- পাকিস্তানের ডক্টর নুরাইন সাহেবা ছিলেন, যার বয়স ছিল ২৮ বছর। তাঁর স্বামী ডক্টর শীরায সাহেব ছিলেন ৩৭ বছরের। উভয়েই চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মুলতানে তাদেরকে এই কারণে শহীদ করা হয়েছিল যে, তারা যুগের ইমামকে গ্রহণ করেছিল। নৃশংসভাবে গলা টিপে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর ২০১০ সালে লাহোরের মডেল টাউনে আমাদের মসজিদ দারুল যিকরে হামলা হয়, তখন অনেক সংখ্যক আহমদীদেরকে শহীদ করা হয়। অনেক যুবক ও কিশোরও এই পথে নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন। এই ঘটনার পর (সন্তানহারা) মায়েরা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তা হল, 'আমরা সকল প্রকার ত্যাগস্বীকারের জন্য প্রস্তুত।' এক মা বলেন, ' আমি আমার যুবক পুত্রকে নিজের ক্রোড় থেকে খোদার ক্রোড়ে অর্পন করেছি। এক দম্পতি একটি মাত্র পুত্র সন্তান আর তিনজন কন্যাসন্তান ছিল। মেডিক্যাল কলেজে পাঠরত তার সেই পুত্র শহীদ হলে পিতামাতা প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন- 'আমরাও জামাতের জন্য উৎসর্গিত হতে প্রস্তুত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভালবাসা যেন আপনাদের সকল ভালবাসার উপরে স্থান পায়। আহমদী মহিলাদের মধ্যে যেন ইসলামের শিক্ষার প্রকৃত নমুনার প্রতিফলন ঘটে। আহমদীয়াতের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা যেন তাদের প্রতিটি কথা ও কাজে প্রকাশ পায় এবং এর বাস্তবিক প্রতিফলনের মাধ্যমে তারা মানুষের মন জয় করতে পারে। তারা যেন আহমদীয়াতের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকে। এখানে এসে জাগতিকতার হৈ-হুল্লোড়ে না মেতে তাদের মধ্যে যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসা ও তাঁর বিধিনিষেধ পালন করার প্রেরণা অন্য সকল প্রেরণা ও কামন-বাসনার উর্দ্ধে থাকে। অতএব কুরবানী ও ত্যাগস্বীকার ও নিজেদের অতীতের এই ঘটনাবলী শুনে কেবল জ্ঞানগতভাবে লাভবান হওয়ার পরিবর্তে সংকল্প করুন যে, আমরা নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অবশ্যই স্বার্থক করব আর নিজেদের বংশধারাকেও এই উদ্দেশ্য অর্জনকারী হিসেবে গড়ে তুলব। আর সেই উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুলের ভালবাসা অর্জন করা এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত বান্দায় পরিণত হওয়া। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন।

জার্মান অতিথিদের উদ্দেশ্য হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন-

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্র আশিস ও করুণা বর্ষিত হোক। কিছু কাল থেকে জার্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহে দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অস্বস্তিকর প্রবৃত্তির মূল কারণ হল, এই দেশগুলির স্থানীয় বাসিন্দারা হতাশার শিকারে পরিণত হচ্ছে। তারা যেন বঞ্চিত ও অবহেলিত। সরকার ও প্রশাসন তাদের অধিকার সমূহ রক্ষা করতে অক্ষম। এই ধারণা তাদের মনে ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির একটি কারণ সেই সমস্ত দেশত্যাগীরা যারা সাম্প্রতিককালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- জার্মানীও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। এই দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। অনেক স্থানীয় মানুষ এই নিয়ে আশঙ্কিত হচ্ছেন যে, এরফলে সমাজে বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। তাদের ধারণা তাদের দেশের সম্পদ ও উপকরণ অন্যায্যভাবে এই সব দেশত্যাগীদের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। অনেকের জন্যই মূল সমস্যা হল ইসলাম, কিন্তু এর জন্য 'অভিবাসী' শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। বস্তুত দেশত্যাগীদের মধ্যে সিংহভাগই মুসলিম, যারা মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভুত যুদ্ধ-পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের দেশ ত্যাগ করছে। তাই দক্ষিণপন্থীরা যখন অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে মিছিলের ডাক দেয়, তখন ইসলামই থাকে তাদের মূল লক্ষ্য। তাদের উদ্দেশ্য হল এই দেশগুলিতে মুসলমানদের প্রবেশ আটকানো।

হুযুর আনোয়ার বলেন- এই সমস্ত মানুষ এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের চেষ্টা করছে যে, ইসলাম পশ্চিমি মূল্যবোধের সঙ্গে মেল খায় না আর মুসলমানেরা পশ্চিমি সমাজে সমন্বিত হতে পারে না। অতএব, এরা অবশিষ্ট নাগরিকদের জন্য বিপজ্জনক। এছাড়াও অনেক অমুসলিমের বিশ্বাস, ইসলাম হল উগ্রপন্থার ধর্ম। তাদের ধারণা, সেই সমস্ত মুসলমান যারা হিজরত করে আসছে তারা উগ্রপন্থী, ধর্ম-উন্মাদ। এই সব মুসলমানেরা সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়াবে, বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং তাদের জাতির শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করবে। এই সব কথা এদেশে, বিশেষ করে পূর্ব জার্মানীতে শোনা গিয়েছে। এই কারণে সেখানে আন্দোলন হচ্ছে এবং মসজিদ নির্মিত হতে না দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা আহমদীরা এই ধরণের বিরোধীতায় আশঙ্কিত নই।

জুমআর খুতবা

“ আঁ হযরত (সা.) নিশ্চয় নিজের প্রিয়জনদের নামকে জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের নিকটাত্মীয়দের সেই সব ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করতেন।”

আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা ব্যাকুল নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী হযরত তুফায়েল বিন হারেস, হযরত সুলায়েম বিন আমর আনসারী, হযরত সুলায়েম বিন হারিস আনসারী, হযরত সুলায়েম বিন মিলহান আনসারী, হযরত সুলায়েম বিন কায়েস আনসারী, হযরত সাহেব বিন সাআলাবা, হযরত সিমাক বিন সাদ, হযরত জাবির বিন রিয়াক, হযরত মুনযের বিন আমর বিন খুনায়েস, হযরত মুবাদ বিন আব্বাদ, হযরত আদি বিন আবি যাআবা আনসারী, হযরত রবী বিন ইয়াস, হযরত উমায়ের বিন আমির আনাসারী, হযরত আবু সিনান বিন মুহিসন, হযরত কায়েস বিন আসসাকান আনসারী, আবুল ইয়াসার কাব বিন আমর রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন -এর পবিত্র জীবনালেখ্য সম্পর্কে আলোচনা।

এরাই ছিলেন সেসব মহান ব্যক্তিত্ব যারা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা’লার প্রতি ভালোবাসার পথও দেখিয়েছেন, আল্লাহ্ তা’লার ভীতির পন্থাও শিখিয়েছেন, আর মহানবী (সা.) এর নির্দেশাবলীকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে মান্য করে পূর্ণ আনুগত্য করার পন্থাও শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা’লা তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৫ জানুয়ারী , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৫ সুলাহ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আজকে আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে প্রথম জন হলেন হযরত তোফায়েল বিন হারেস। তোফায়েল বিন হারেসের সম্পর্ক ছিল কুরাইশের সাথে। তার মাতার নাম ছিল সুকায়লা বিন খুযাঈ। মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত তোফায়েল বিন হারেস এবং হযরত মুনযের বিন মুহাম্মদ বা অন্য কতক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সুকিয়ান বিন মুহাম্মদের সাথে তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত তোফায়েল বিন হারেস নিজের ভাই হযরত উবায়দা এবং হযরত হোসেন এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। একইভাবে ওহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ৩২ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন হযরত সোলায়েম বিন আমর আনসারী। তার মাতার নাম ছিল উম্মে সোলায়েম বিনতে আমর। তার সম্পর্ক খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা গোত্রের সাথে ছিল আর কোন কোন রেওয়ায়েতে তার নাম সোলেমান বিন আমরও দেখা যায়। আকাবায় ৭০ ব্যক্তির সাথে তিনিও বয়আত করেন। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের সময় তার শাহাদতের ঘটনা ঘটে। তার সাথে তার কৃতদাস আনতারাও ছিল।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ করা হবে তার নাম হলো হযরত সোলায়েম বিন হারেস আনসারী। তার সম্পর্ক খাযরাজ গোত্রের বনি দিনারের সাথে। তার সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, তিনি বনি দিনার বংশের কৃতদাস ছিলেন। আর এটিও বলা হয় যে, তিনি যিহাক বিন হারেসের ভাই। যাহোক এই উভয় রেওয়ায়েতই রয়েছে। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর ওহুদের যুদ্ধে শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

এরপর রয়েছেন হযরত সোলায়েম বিন মিলহান আনসারী। তার মাতা ছিলেন মুলায়েকা বিনতে মালেক। তিনি আনাস বিন মালেকের মামা আর উম্মে হারাম এবং উম্মে সোলায়েমের ভাই ছিলেন। হযরত উম্মে হারাম হযরত উবাদা বিন সামেত এর সহধর্মিণীছিলেন। আর হযরত উম্মে সোলায়েম হযরত আবু তালহা আনসারীর স্ত্রী ছিলেন। আর তার পুত্র হযরত আনাস বিন মালেক মহানবী (সা.) এর সেবক ছিলেন। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে তিনি তার ভাই হারাম বিন মিলহানের সাথে সহযোদ্ধা ছিলেন। তারা উভয়েই বিরে মঊনার ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯১,দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

মহানবী (সা.) এর হিজরতের পর ৩৬তম মাসে অর্থাৎ সফর মাসে বিরে মঊনার দিকে হযরত মুনযের বিন আমর আসসায়েদী-র সারিয়া সংঘটিত হয়। আমের বিন জাফর মহানবী (সা.) এর কাছে আসে এবং তাঁকে উপহার দিতে চায়। যা গ্রহণে তিনি (সা.) অস্বীকৃতি জানান। তিনি (সা.) তাকে ইসলামের তবলীগ করেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে নি আবার ইসলাম থেকে দূরেও যায় নি। আমের বলে যে, আপনি যদি আপনার কয়েকজন সাথি আমার সাথে আমার জাতির প্রতি প্রেরণ করেন তাহলে আশা করা যায় যে, তারা আপনার ডাকে সাড়া দেবে। তিনি (সা.)বলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, নাজাদবাসীরা তাদের কোন ক্ষতি না করে বসে। সে বলে, কেউ যদি তাদের সামনে আসে তাহলে আমি তাদের আশ্রয় দিব। মহানবী (সা.) ৭০জন যুবক, যাদেরকে কুরআনের ক্বারী বলা হতো, তার সাথে প্রেরণ করেন। আর হযরত মুনযের বিন আমর আসসায়েদিকে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। এ ঘটনা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। যখন তারা বিরে মঊনা নামক স্থানে পৌঁছন, যা বনু সুলায়েমের ঘাট (বা কূপ) ছিল আর আমের এবং বনু সুলায়েমের ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, তারা সেখানেই যাত্রা বিরতি দেন এবং শিবির স্থাপন করেন। নিজেদের উটের রশি খুলে দেন। তিনি প্রথমে হযরত হারাম বিন মিলহানকে মহানবী (সা.) এর বাণী সহকারে আমের বিন তোফায়েলের কাছে প্রেরণ করেন। সে মহানবী (সা.) এর বার্তা পড়েওনি। আর হযরত হারাম বিন মিলহানের ওপর হামলা করে তাকে শহীদ করে। এরপর সে বনি আমেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আহ্বান করে। কিন্তু তারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেন। এরপর সে সোলায়েম বিন উসাইয়া, যাকওয়ান এবং রেল-কে ডাকে। তারা তার সাথে বের হয় এবং তাকে নিজেদের নেতা নিযুক্ত করে। হযরত হারাম বিন মিলহানের ফিরতে বিলম্ব হলে মুসলমানরা তার

খবরাখবর জানার জন্য বের হয়। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা সেই দলের মুখোমুখি হয় যারা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসছিল। তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলে। শত্রুদের সংখ্যা বেশি ছিল, যুদ্ধ হয়, মহানবী (সা.) এর সাথিদের শহীদ করে দেওয়া হয়। মুসলমানদের মাঝে হযরত সোলায়েম বিন মিলহান এবং হাকাম বিন কিসানকে যখন ঘিরে ফেলা হয় তখন তারা বলেন যে, হে আল্লাহ্ তুমি ছাড়া আমাদের জন্য এমন কেউ নেই যে তোমার রসূল (সা.) কে আমাদের সালাম পৌঁছাবে তাই তুমিই আমাদের সালাম পৌঁছাও। মহানবী (সা.) কে যখন জিবরাঈল এই সংবাদ দেয় তখন তিনি বলেন যে, 'ওয়া আলায়হিমুস সালাম'। অর্থাৎ তাদের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক। মুনযের বিন আমর তাদেরকে বলেন, যদি তোমরা চাও আমরা তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিব, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তারা হযরত হারাম-এর শাহাদতের স্থানে এসে তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। আর অবশেষে তাদেরকে শহীদ করে দেয়া হয়। মহানবী (সা.)বলেন, তারা মৃত্যুর জন্য এগিয়ে আসে অর্থাৎ জেনেশুনে মৃত্যুর সামনে এসে যান।

(আততাবকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯-৪০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও বড় বীরত্বের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন। এছাড়া তারা যুদ্ধের জন্য যানও নি।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে হযরত সোলায়েম বিন কায়েস আনসারীর। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে সোলায়েম বিনতে খালেদ। তিনি হযরত খওলা বিনতে কায়েস-এর ভাই ছিলেন, যিনি ছিলেন হযরত হামযার স্ত্রী। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত ওসমানের খিলাফতকালে তার মৃত্যু হয়।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৫ -৫৪৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত সাবেত বিন সালেবা। তার নাম ছিল হযরত সাবেত বিন সালেবা। তার মায়ের নাম ছিল হযরত উম্মে উনাস বিনতে সাদ, যার সম্পর্ক ছিল বনু উযরা গোত্রের সাথে। তার পিতা সালেবা বিন যায়েদকে আলজেযাও বলা হতো। এটি তার বীরত্ব এবং সুদৃঢ় সংকল্প ও মনোবলের কারণে রাখা হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই হযরত সাবেতকেও আলজেযা বলা হয়। হযরত সাবেত বিন সালেবা এর সন্তানসন্ততির মাঝে আব্দুল্লাহ্ এবং হারেস অন্তর্ভুক্ত। তাদের সকলের মা ছিলেন হুমামা বিনতে ওসমান। হযরত সাবেত ৭০ জন সাহাবীর সাথে আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়ার সন্ধি, খায়বার, মক্কা বিজয় আর তায়েফের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তায়েফের যুদ্ধের দিনই তিনি শাহাদত বরণ করেছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৮-৪২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত সিমাক বিন সাদ। তার পিতা ছিলেন হযরত সাদ বিন সালেবা। তিনি হযরত নুমান বিন বশীর-এর পিতা হযরত বশীর বিন সাদ এর ভাই ছিলেন। নিজের ভাই হযরত বশীরের সাথে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ওহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেছেন। খাযরাজ গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিয়াব। হযরত জাবেরকে সেই ছয়জন আনসারের মাঝে গণনা করা হয় যারা মক্কায় সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত জাবের বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

উকবার প্রথম বয়আতের পূর্বে কয়েকজন আনসারের সাথে মক্কায় মহানবী (সা.) এর সাক্ষাৎ হয়। তাদের সংখ্যা ছিল ছয়। সেই ছয় ব্যক্তি হলেন- উসআদ বিন যুরারা, অউফ বিন হারেস, রাফে বিন মালেক বিন আজলান, কুতবা বিন আমের বিন লাদিদা, উকবা বিন আমের বিন নাবি এবং জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিয়াব। তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। মদীনায় ফিরে আসার পর তারা মদীনাবাসীদের কাছে মহানবী (সা.)এর কথা উল্লেখ করে।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এর বিশদ বিবরণ উকবা বিন আমের নাবি-র স্মৃতিচারণে এসে গেছে। এখানেও সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। তারা যখন মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে বিদায় নেয় তখন যাওয়ার বেলায় তারা বলে, গৃহযুদ্ধ আমাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল করে তুলেছে, আমাদের নিজেদের মাঝে বহু মতানৈক্য রয়েছে। আমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের ভাইদেরকে ইসলামের তবলীগ করব। আল্লাহ্ তা'লা হয়ত আপনার শিক্ষা এবং আমাদের তবলীগের মাধ্যমে আমাদের পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করবেন। আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাব তখন সকল অর্থে আপনার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকব। অতএব তারা ফিরে যান এবং তাদের কারণে মদীনায় ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। এ বছরটিকে মহানবী (সা.) মক্কায় মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে বাহ্যিক অবস্থা ও পরিস্থিতির নিরিখে এমনভাবে অতিবাহিত করেছেন যাতে ভয়ও ছিল আর আশাও ছিল। অর্থাৎ দেখা যাক যে, এই ছয়জন সত্যায়নকারী, যারা বয়আতের পর ফিরে গেছে, তাদের কী পরিণাম হয়। মদীনায় কোন সাফল্য আসবে কি, কোন আশা জাগবে কি? কেননা অন্যান্য স্থানে মহানবী (সা.) কে শুধু অস্বীকারই করা হয় নি বরং বিরোধিতাও চরম পর্যায়ে উপনীত ছিল। মক্কা এবং তায়েফের নেতারা মহানবী (সা.) এর প্রচারকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর তাদের প্রভাবাধীন হয়ে অন্যান্য গোত্রও একে একে তাঁকে (সা.) প্রত্যাখ্যান করছিল। তাই তাদের বয়আতের কারণে মদীনায় একটি আশার আলো দেখা দেয়। কিন্তু তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কে জানতো যে, এই ছয়জন মান্যকারী,যাদের সত্তায় একটি আশার আলো জেগেছে,শত্রু তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলে তারা সমস্যা ও বিপদাপদের মোকাবেলা করতে পারবে?

যাহোক তারা ফিরে যান এবং তবলীগ করেন। কিন্তু একইসাথে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে শত্রুতা এবং বিরোধিতা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার এটিই মোক্ষম সময়, কেননা মক্কা থেকে যদি তা বাহিরে চলে যায় আর বিস্তার লাভ করতে থাকে তাহলে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা কঠিন হয়ে যাবে। তাই মক্কাবাসীরা বিরোধিতা চরমে পৌঁছিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) এবং তাঁর নিষ্ঠাবান সাহাবী, যারা বয়আত করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা এক অটল পাহাড়ের ন্যায় নিজ জায়গায় অবিচল ছিলেন। কোন কিছু তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না, তৌহীদ থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। যাহোক ইসলামের জন্য এটি খুবই স্পর্শকাতর এক সময় ছিল। আশাও ছিল আর ভীতিও ছিল যে, এরা মদীনায় গিয়েছে, দেখা যাক কী ফলাফল প্রকাশ পায়।

পরবর্তী বছর পুনরায় মদীনা থেকে একটি প্রতিনিধি দল হজ্জের জন্য আসে। মহানবী (সা.) গভীর আগ্রহে বুক বেঁধে ঘর থেকে বের হনআর মিনার পাশে উকবায় পৌঁছে এদিকে সেদিক দৃষ্টিপাত করলে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি ইয়াসরেবের একটি ছোট্ট দলের ওপর পড়ে যারা তাকে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে চিনতে পারে আর গভীর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে এসে তাঁর (সা.) সাথে মিলিত হয়। তাদের মাঝে পাঁচজন তারা-ই ছিলেন যারা পূর্বে বয়আত করেছিলেন, আর সাতজন ছিলেন নতুন। তারা অউস এবং খাযরাজ উভয় গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। মহানবী (সা.)মানুষের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তাদেরকে একপাশে একটি উপত্যকায় নিয়ে যান, আর বারো সদস্য বিশিষ্ট এই প্রতিনিধি দল, যারা সেখান থেকে এসেছিল, তারা মহানবী (সা.) কে মদীনার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে এবং তারা সকলেই যথারীতি মহানবী (সা.) এর হাতে বয়আত করে। আর এই বয়আতই মদীনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার মৌলিক ভিত্তিপ্রস্তর ছিল।

ইমামের বাণী

" আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই, যে পাপ বর্জন করে ও পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়।"

(ফতেহ ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৩২-৩৩)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

মহানবী (সা.) যে শব্দে তাদের কাছ থেকে বয়আত নিয়েছিলেন তাহলো- আমরা খোদাকে এক অদ্বিতীয় বিশ্বাস করবো, শিরক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না, হত্যা করা থেকে বিরত থাকব, কারো ওপর অপবাদ আরোপ করবো না, আর সকল পুণ্যকর্মে আপনার আনুগত্য করবো। বয়আতের পর মহানবী (সা.)তাদেরকে বলেন, দেখ! যদিতোমরা নিষ্ঠা, অবিচলতা আর সততা ও দৃঢ়তার সাথে এই অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে তোমরা জান্নাত লাভ করবে আর যদি তোমরা দুর্বলতা দেখাও তাহলে তোমাদের সাথে বোঝাপড়া করবেন আল্লাহ্ তা'লা। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামাননাবীঈন, পৃ: ২২২-২২৪)

যাহোক তারা তাদের বয়আতের অঙ্গীকার সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। আর শুধু পালন করেই দেখান নি বরং উন্নত মানে পৌঁছিয়েছে । আর মদীনায় কিভাবে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে তা আমরা পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের আয়নায় দেখতে পাই।

হযরত মুনযের বিন আমর বিন কুনায়েস আরেকজন সাহাবী যার এখন স্মৃতিচারণ হবে। যার উপাধী ছিল মুনেক লেইয়ামুত বা মুনেকু লিলমওত অর্থাৎ এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গনকারী। তার নাম ছিল মুনযের আর পিতার নাম ছিল আমর। আনসারের খাযরাজ গোত্রের বনু সায়েদা বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.)মুনযের বিন আমর এবং হযরত সাদ বিন উবাদাকে তাদের গোত্র বনু সায়েদার নেতা নিযুক্ত করেন, অর্থাৎ সর্দার নিযুক্ত করেন। অজ্ঞতার যুগেও হযরত মুনযের পড়ালেখা জানতেন। মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত মুনযের এবং হযরত তোলায়েব বিন উমায়ের এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত মুনযের বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

(উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত মুনযের বিন আমর সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে লিখেছেন যে, তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু সায়েদা বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং একজন সুফী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বি'রে মঊনায় শাহাদত বরণ করেন। বি'রে মঊনার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বের সাহাবীদের স্মৃতিচারণে এসে গেছে। হযরত মুনযের বিন আমরের প্রেক্ষাপটে সংক্ষিপ্তভাবে সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তক থেকে কিছুটা এখানে বর্ণনা করছি।

সোলায়েম এবং গাতফান গোত্র মধ্য আরবের নাজাদ মালভূমিতে বসবাস করতো। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিল যে, কীভাবে ইসলামকে নির্মূল করা যায়। আর এই দুষ্কৃতকারী গোত্রের দুষ্কৃতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিলআর পুরো নাজাদ মালভূমি ইসলামের শত্রুতার বিষবাষ্পে আক্রান্ত হচ্ছিল এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। সেই দিনগুলোতে আবু বারা আমের নামের এক ব্যক্তি, যে মধ্য আরবের একটি গোত্র বনু আমেরের নেতা ছিল, মহানবী (সা.) এর সাথে সাক্ষাতের মানসে উপস্থিত হয়। পূর্বেও এটি উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সা.)একান্ত নমনীয়তার সাথে তাকে ইসলামের তবলীগ করেন। সে-ও বাহ্যত একান্ত আগ্রহের সাথে তবলীগ শুনে কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে নি। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সে মহানবী (সা.) এর কাছে বলে যে, আমার সাথে কয়েকজন সাহাবীকে নাজাদ এর দিকে প্রেরণ করুন যারা সেখানে গিয়ে নাজাদবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রচার করবে। একইসাথে এটিও বলে যে, আমি আশা করি নাজাদ এর মানুষ আপনার বাণী প্রত্যাখ্যান করবে না। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, আমার নাজাদবাসীদের ওপর কোন আস্থা নেই। আবু বারা বলে, আপনি আদৌকোন চিন্তা করবেন না। যারা আমার সাথে যাবে আমি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করছি। আবু বারা যেহেতু এক গোত্রের নেতা এবং প্রভাবশালী মানুষ ছিল তাই তার আশ্বস্ত করাতে তিনি (সা.) বিশ্বাস করেন এবং সাহাবীদের একটি দল নাজাদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, এটি হলো ইতিহাসের বর্ণনা। কিন্তু বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে যে, রেল এবং যাকওয়ান ইত্যাদি গোত্র প্রসিদ্ধ বনি সোলায়েম গোত্রের শাখা ছিল। তাদের কিছু লোক মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয় আর মুসলমান হওয়ার ভান করে অনুরোধ করে যে, আমাদের জাতির যারা ইসলামের শত্রু তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। এটি স্পষ্ট ছিল না যে, তারা সামরিক সাহায্য চাচ্ছিল নাকি তবলীগের উদ্দেশ্যে সাহায্য চাচ্ছিল। যাহোক তারা কয়েক ব্যক্তিকে পাঠানোর অনুরোধ করে। তখন মহানবী (সা.) এই সৈন্যদল প্রেরণ করেন যাদের কথা আলোচিত হচ্ছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, দুর্ভাগ্যবশত বি'রে মঊনার খুটিনাটি সম্পর্কে বুখারীর রেওয়ায়েতেও কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে, অর্থাৎ দুটি ঘটনার কিছু বর্ণনা মিশে গেছে। তাই বুখারীর রেওয়ায়েত এবং ইতিহাসের ঘটনা থেকে সঠিকভাবে বোঝা যায় না যে, প্রকৃত বিষয় কী, যে কারণে আসল কথা পুরোপুরি চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। যাহোক তিনি এর একটি সমাধানও খুঁজে বের করেছেন। তিনি বলেন, এতটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন রেল ও যাকওয়ান গোত্রের লোকেরাও মহানবী (সা.) এর সকাশে এসে থাকবে আর তারা কয়েকজন সাহাবীকে তাদের সাথে পাঠানোর আবেদনও করে থাকবে। এই উভয় রেওয়ায়েতের মাঝে সামঞ্জস্য এভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে, অর্থাৎ তিনি লিখেন, দুটো ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, এগুলোর মাঝে যদি সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে হয় বা এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক যদি স্পষ্ট করতে হয় অথবা এগুলোর মাঝে যদি মিল খুঁজে বের করতে হয় তাহলে তা এভাবে সম্ভব হতে পারে যে, রেল এবং যাকওয়ান এর লোকদের সাথে আমর গোত্রের নেতা আবু বারা আমরিও হয়ত এসে থাকবে। সে তাদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) এর সাথে কথা বলে থাকবে। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.) এর এই কথা বলা যে, আমি নাজাদবাসীদের সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে পারছি না, আর এরপর তার এই উত্তর দেয়া যে, আপনি কোন চিন্তা করবেন না আমি নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আপনার সাহাবীদের কোন ক্ষতি হবে না-এটি এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে, তার সাথে রেল এবং যাকওয়ানের লোকেরাও এসে থাকবে, যে কারণে মহানবী (সা.) চিন্তিত ছিলেন।

যাহোক মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে মুনযের বিন আমর আনসারীর নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন। এদের বেশিরভাগই আনসার ছিল আর তারা সংখ্যায় ছিল ৭০। তাদের প্রায় সবাই কুরআনের ক্বারী বা কুরআনের পাঠক ছিলেন। যখন তারা সেই স্থানে পৌঁছেন যা একটিকূপের কারণে বি'রে মঊনা নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তখন তাদের একজন হযরত আনাস বিন মালেকের মামা হযরত হারাম বিন মিলহান ইসলামের বাণী নিয়ে আমের গোত্রের নেতা এবং আবু বারা আমরীর ভাতুষ্পুত্র আমের বিন তোফায়েলের কাছে যান,আর বাকি সাহাবীরা পেছনে অবস্থান করেন। হারাম বিন মিলহান যখন মহানবী (সা.)এর দূত হিসেবে আমের বিন তোফায়েল এবং তার সাথীদের কাছে পৌঁছেন তখন তারা প্রথমদিকে কপটতাপূর্ণ আতিথেয়তা করে। কিন্তু এরপর যখন তিনি নিশ্চিন্তে বসেন এবং ইসলামের তবলীগ আরম্ভ করেন তখন, যেভাবে পূর্বে এর উল্লেখ করা হয়েছে, কতক দুষ্কৃতকারী কোন এক ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে আর সে পেছন থেকে বর্শার হামলায় তাকে শহীদ করে। তখন হযরত হারাম বিন মিলহানের মুখে এই বাক্য ছিল যে, 'আল্লাহু আকবর, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা' অর্থাৎ আল্লাহু আকবর, কাবা শরীফের প্রভুর কসম, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। আমের বিন তোফায়েল শুধু যেমহানবী (সা.) এর দূতকে হত্যা করেছে তা নয়, বরং এরপর স্বীয় গোত্র বনু আমের এর লোকদের উত্তেজিত করে মুসলমানদের অবশিষ্ট দলটির ওপর হামলা করার জন্য। কিন্তু, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এখানে বর্ধিত কথা যা হয় তাহলো- আমরা আবু বারা এর নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তার বর্তমানে মুসলমানদের ওপর হামলা করবো না, কেননা আবু বারা মহানবী (সা.) এর কাছে বলেছিল যে, আমি তাদের নিরাপত্তার জন্য দায়ী। সে যেহেতু নিশ্চয়তা প্রদান করেছে তাই আমরা হামলা করব না।

তখন আমের দ্বিতীয় গোত্রের অর্থাৎ সোলায়েমের বনু রেল, যাকওয়ান এবং উসাইয়াদের, যারা বুখারীর রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) এর কাছে প্রতিনিধি দল হিসেবে এসেছিল, নিজের সাথে নেয় আর তারা সবাই মুসলমানদের এই স্বল্প সংখ্যক ও অসহায় জামা'তের ওপর হামলা করে। মুসলমানরা যখন এই বন্য রক্তপিপাসুদের নিজেদের দিকে আসতে দেখলো তখন তাদেরকে বলে যে, তোমাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই, আমরা যুদ্ধ করতে আসি নি। আমরা মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে একটি কাজের জন্য এসেছি। তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার আমাদের আদৌ কোন ইচ্ছা নেই। কিন্তু তারা কোন কথার প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং তাদের সবাইকে শহীদ করে।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামাননাবীঈন, পৃ: ৫১৭-৫১৯)

ইতিহাসে রয়েছে যে, জিবরাঈল (আ.) যখন বি'রে মঊনার শহীদদের সম্পর্কে সংবাদ দেন তখন যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে অর্থাৎ মুনযের বিন আমর সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, 'আনাকা লেইয়ামুত'।অর্থাৎ হযরত মুনযের বিন আমর এটি জেনেও যে, এখন শাহাদতই (মৃত্যুই) অদৃষ্ট, নিজের সাথিদের মতো সেই স্থানেই যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছেন। এ কারণে তিনি 'মুনেক লেইয়ামুত' বা 'মুনেকু লিলমউত'উপাধিতে বেশি পরিচিত ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

তারা হযরত মুনযের বিন আমরকে বলেছিল যে, তুমি যদি চাও আমরা তোমাকে নিরাপত্তা দিব,কিন্তু হযরত মুনযের তাদের নিরাপত্তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৫৮-২৫৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

হযরত সাহাল বর্ণনা করেন, আবু উসায়েদের ঘরে যখন হযরত মুনযের বিন আবি উসায়েদের জন্ম হয় তখন তাকে মহানবী (সা.) এর কাছে আনা হয়। তিনি (সা.) এই শিশুকে নিজের উরুতে বসান। হযরত আবু উসায়েদ তখন বসে ছিলেন। ততক্ষণে মহানবী (সা.) কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হযরত আবু উসায়েদ ইঙ্গিত করলে মানুষ মুনযেরকে তাঁর (সা.)রানের ওপর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর (সা.) কাজ যখন শেষ হয় তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, শিশুটি কোথায় গেল। হযরত আবু উসায়েদ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তার নাম কী রেখেছ। আবু উসায়েদ বলেন যে, অমুক নাম রেখেছি। তিনি (সা.) বলেন যে, না, তার নাম হবে মুনযের। তিনি (সা.) সেদিন সেই শিশুর নাম রাখেন মুনযের। ইনি সেই মুনযের নন যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে। মহানবী (সা.) এর এই বাচ্চার নাম মুনযের রাখার কারণ ভাষ্যকারেরা এটি উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবু উসায়েদের চাচার নাম মুনযের বিন আমর ছিল, সেই সাহাবী যিনি বি'রে মঊনার ঘটনায় শহীদ হয়েছেন। অতএব এই নাম রাখা হয়েছে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায়। অর্থাৎ এই শিশু তার উত্তম স্থলাভিষিক্ত প্রমাণিত হবে এই আশায়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৬১৯১) (ফাতহুল বারি শরাহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২, দারুর রিয়ান দ্বারা কায়েরো থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৮৬ সাল)

কারণ হয়ত এটিও হবে যে, মহানবী (সা.) তার প্রিয়জনদের নামকে জীবিত রাখার জন্য তাদের নিকটাত্মীয়স্বজনকে তাদের নামে নামকরণ করতেন।

হযরত মাবাদ বিন আব্বাদ ছিলেনআরেকজন সাহাবী, যার ডাকনাম ছিল আবু হুনায়যা। তার পিতা ছিলেন আব্বাদ বিন কুশায়ের। হযরত মাবাদ বিন আব্বাদ এর নাম মাবাদ বিন উবাদা এবং মাবাদ বিন আমারা-ও বলা হয়েছে। তার সম্পর্ক ছিল খাযরাজ গোত্রের শাখা বনি সালাম বিন গানাম বিন অউফ এর সাথে। তিনি আবু হুমায়সা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কারো কারো মতে তার ডাকনাম আবু খুনায়সা এবং আবু উসায়মাও বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

(উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১১-২১২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৮, ৪১১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত আদি বিন আবি যাগবা আনসারী। তার পিতার নাম ছিল সিনান বিন সুবায়হ্‌। তিনি হযরত ওমরের খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। হযরত আদির পিতা আবি যাগবার নাম ছিল সিনান বিন সুবায়হ বিন সালেবা। আনসারের জুহায়না গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

মহানবী (সা.) তাকে হযরত বাসবাস বিন আমরের সাথে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য বদরের যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ানের কাফেলার দিকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি খবর সংগ্রহের জন্য বের হন আর এক পর্যায়ে যেতে যেতে সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে যান। হযরত বাসবাস বিন আমর এবং হযরত আদি বিন আবি যাগবা বদর নামক স্থানে এক টিলার পাশে নিজেদেরউষ্ট্রী বসান যা একটি ঝরনার পাশে অবস্থিত ছিল। এরপর তারা নিজেদের মশক উঠিয়ে ঘাটে পানি সংগ্রহের জন্য আসেন। মাজদি বিন আমর জুহনী নামের এক ব্যক্তি ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা উভয়েই দুজন মহিলার কাছে শুনেছেন যে, দুজনের একজন অন্যজনকে বলছিল, কাল বা পরশু কাফেলা আসলে আমি কায়িক শ্রম করে তোমার ঋণ পরিশোধ করব। কথা দুজন মহিলার মাঝে হচ্ছে,কিন্তু এতে তথ্য ছিল। মাজদি বলেন তুমি ঠিক বলছ। এরপর সে এই দুই মহিলার কাছ থেকে প্রস্থান করে। হযরত আদি এবং হযরত বাসবাস এই কথাগুলো শুনেন। তারা এসে মহানবী (সা.) কে সংবাদ দেন। (কিতাবুল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০, বাব বদরুল কিতাল) অর্থাৎ আমরা এ কথা শুনেছি যে দুজন মহিলা কথা বলছিল একে অন্যের সাথে যে, একটি কাফেলা আসবে। এটি কাফেরদের কাফেলা সংক্রান্ত সংবাদ ছিল। এভাবে তারা খবরাখবর পৌঁছাতেন। বাহ্যত এটি কেবল দুজন মহিলার মধ্যবর্তী আলাপচারিতা ছিল। কিন্তু তারা এর গুরুত্ব বুঝতেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর ছিল। কাফেলার আসার সংবাদ ছিল। হযরত আদি বিন আবি যাগবা হযরত ওমরের খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন।

(আসাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৯১-৩৯২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

আরেকজন সাহাবী হলেন রবী বিন ইয়াস। আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু লুদান এর সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি নিজের ভাই ওরকা বিন আইয়াস এবং আমর বিন আইয়াসের সাথে বদরের যুদ্ধেঅংশগ্রহণ করেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৬-৪১৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

আরেকজন সাহাবীর নাম হলো হযরত উমায়ের বিন আমের আনসারী। তার ডাকনাম ছিল আবু দাউদ। তার পিতা ছিলেন আমের বিন মালেক। তার মায়ের নাম ছিল নায়েলা বিনতে আবি আসেম। আনসারের খাযরাজ গোত্রের সাথে হযরত উমায়ের এর সম্পর্ক ছিল। তিনি আবু দাউদ ডাকনামেই বেশি পরিচিত। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

(আসাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৫) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৮, ৪১১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত উম্মে উম্মারা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু দাউদ মাযনি অর্থাৎ হযরত উমায়ের এবং সুলায়েব বিন আমর উভয়ই আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণের জন্য বের হন। তারা জানতে পারেন যে, মানুষ ইতিমধ্যেই বয়আত করে নিয়েছে। তখন তারা পরবর্তীতে হযরত আসাদ বিন যুরারার মাধ্যমে বয়আত করেন, যাকে উকবার রাতে নেতাদের একজন নিযুক্ত করা হয়েছিল।

(আসাবা ৭ম খণ্ড, পৃ: ৯৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৫)

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে বদরের যুদ্ধে আবুল বাখতারিকে হত্যাকারী হযরত উমায়ের বিন আমেরই ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত সাদ, যিনি হাতেব বিন আবি বালতাহ এর মুক্ত কৃতদাস ছিলেন। তার সম্পর্ক ছিল বনু কালব গোত্রের সাথে। হযরত সাদ বিন খওলি হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ্‌ এর মুক্ত কৃতদাস ছিলেন। আবু মাহশার এর মতে তার সম্পর্ক বনু মাযহাজ এর সাথে ছিল। কারো কারো মতে তিনি পারস্যবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাদ বিন খওলী ক্রীতদাস হিসেবে হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ্‌ এর কাছে আসেন। হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ্‌ তার সাথে পরম স্নেহমমতা প্রদর্শন করতেন। তিনি হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ্‌ এর সাথে বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

করেন। ওহুদের যুদ্ধে তার শাহাদতের ঘটনা ঘটে। হযরত ওমর হযরত সাদের পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিন সাদের জন্য আনসারদের সাথে ভাতা নির্ধারণ করেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (সীরাতুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, ভাগ-৭. পৃ: ৩১৮)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত আবু সিনান বিন মিহসান। তার পিতার নাম ছিল মিহসান বিন হাসসান। তার ডাকনাম ছিল আবু সিনান। তার নাম ছিল ওহাব বিন আব্দুল্লাহ্ আর ডাকনাম ছিল আবু সিনান। অবশ্য আব্দুল্লাহ্ বিন ওহাবও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ইতিহাস অনুসারে তার সবচেয়ে সঠিক নাম হলো ওহাব বিন মিহসান। হযরত সিনান বিন মিহসান ওকাশা বিন মিহসানের ভাই ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৫৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

তিনি হযরত ওকাশা বিন মিহসান থেকে বয়সে বড় ছিলেন, সে সম্পর্কে রেওয়ায়েত হলো তিনি হযরত ওকাশা থেকে প্রায় দুই বছর বড় ছিলেন। অবশ্য বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, কেউ বলেছে দশ বছর আর কেউ বলেছে কুড়ি বছর।

(উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৫৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (আররওযুল উনুফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত)

তার পুত্রের নাম সিনান বিন আবু সিনান ছিল। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে বয়আতে রিযওয়ানের সময় সর্বপ্রথম বয়আতকারী হযরত আবু সিনান বিন মিহসানই ছিলেন, কিন্তু এটি সঠিক নয় কেননা হযরত আবু সিনান বনু কুরায়যার দুর্গ ঘেরাওয়ের সময় ৫ম হিজরীতে ৪০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন। আর বয়আতে রিযওয়ানের সময় বয়আতকারী ছিলেন তার পুত্র হযরত সিনান বিন আবু সিনান। হযরত আবু সিনান বিন মিহসানের মৃত্যু তখন হয় যখন মহানবী (সা.) বনু কুরায়যার দুর্গ ঘেরাও করেন। মহানবী (সা.) তাকে বনু কুরায়যার কবরস্থানে সমাহিত করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

আরেকজন সাহাবী হলেন হযরত কায়েস বিন আসসাকান আনসারী। তার ডাকনাম ছিল আবু যায়েদ। হযরত কায়েসের পিতার নাম ছিল সাকান বিন যহুরা। আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু আদি বিন নাজ্জার এর সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তিনি আবু যায়েদ ডাকনামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। বদর, ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সেসব সাহাবীর মাঝে গন্য হন যারা মহানবী (সা.) এর যুগে কুরআন শরীফ সংকলন করেন।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪০৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (আসাবা ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

হযরত আনাস বিন মালেক বলেন, মহানবী (সা.) এর যুগে আনসারদের চার ব্যক্তি কুরআন করীম একত্রিত করেছেন। এই চারজন হলেন- যায়েদ বিন সাবেত, মায বিন জাবাল, উবাই বিন কাব এবং আবু যায়েদ অর্থাৎ কায়েস বিন সাকান। হযরত আবু যায়েদ সম্পর্কে হযরত আনাস বলেন যে, তিনি আমার চাচা ছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাব মানাকিবুল আনসার, হাদীস: ৩৮১০)

অষ্টম হিজরীতে মহানবী (সা.) হযরত আবু যায়েদ আনসারী এবং হযরত আমর বিন আস আসসাহমীকে একটি পত্রসহ জলন্দীর দুই পুত্র উবায়েদ ও জাফরের কাছে পাঠান যাতে তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। আর উভয়কে বলেন যে, তারা যদি ইসলামের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তাহলে আমর তাদের আমীর হবেন আর আবু যায়েদ হবেন তাদের নামাযের ইমাম। অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর দৃষ্টিতে হয়ত তার ধর্মীয় অবস্থা উন্নত হবে বা কুরআনের জ্ঞান বেশি থাকবে। তিনি বলেন যে, সে ইমামুস সালাত হবে, তাদের মাঝে ইসলাম প্রচার করবে আর তাদেরকে কুরআন ও সুন্নতের শিক্ষা দেবে। তারা উভয়ে উমান যান আর সমুদ্রতীরবর্তী সিহার-এ উবায়েদ এবং জাফর-এর সাথে মিলিত হন এবং তাদের হাতে মহানবী (সা.) এর পত্র প্রত্যর্পণ করেন। তারা উভয়ে পুরো কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তারা স্থানীয় আরবদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করে। তারাও ইসলাম গ্রহণ করে। দেখুন তবলীগের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তার লাভ করছে, সেখানে কোন যুদ্ধ, হত্যা বা হামলা এবং তরবারি তো যায় নি। যাহোক সেসব আরবওইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) এর ইন্তেকাল পর্যন্ত আমর এবং আবু যায়েদ উমানেই অবস্থান করেন। কিন্তু কারো কারো মতে আবু যায়েদ এর পূর্বেই মদীনায় চলে আসেন।

(ফুতুহুল বালদান, পৃ: ৫৩, 'উমান')

হযরত কায়েসের শাহাদতের ঘটনা জিসার এর দিনে হয়।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত ওমর এর খিলাফতকালে ইরানীদের সাথে যুদ্ধে ফোরাৎ নদীর ওপর যে পুল নির্মাণ করা হয়েছিল সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই যুদ্ধকে ইয়াওমে জিসার বলা হয়। (মুজামিল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬২-১৬৩)

এরপর যে সাহাবীর উল্লেখ করা হচ্ছে তিনি হলেন হযরত আবুল ইয়াসার কাব বিন আমর। তার ডাকনাম ছিল আবুল ইয়াসার। আবুল ইয়াসার এর সম্পর্ক ছিল বনু সালামা গোত্রের সাথে। তার পিতা ছিলেন হযরত আমর বিন আব্বাদ। তার মায়ের নাম ছিল নসীবা বিনতে আযহার। তিনিও বনু সালামারই সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি হযরত আব্বাসকে গ্রেপ্তার করেছেন। তিনি হলেন সেই সাহাবী যিনি বদরের যুদ্ধে আবু ইয়াযিদ বিন উমায়েরের হাত থেকে মুশরেকদের পতাকা ছিনিয়ে নেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে তিনি অন্যান্য যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আলীর সাথে সিফফিনের যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেন।

(উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩২৬-৩২৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (

এক বর্ণনা অনুসারে বদরের যুদ্ধে হযরত আব্বাসকে যিনি বন্দী করেছিলেন তিনি হলেন হযরত উবায়েদ বিন অউস।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫২৮-৫২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত ইবনে আব্বাস এর পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, বদরের যুদ্ধের দিন যে ব্যক্তি হযরত আব্বাসকে গ্রেপ্তার করে তার নাম ছিল আবুল ইয়াসার। আবুল ইয়াসার তখন শীর্ণকায় ব্যক্তি ছিলেন। বদরের যুদ্ধের সময় তিনি বিশ বছর বয়স্ক যুবক ছিলেন। অথচ হযরত আব্বাস ছিলেন স্থূলকায় ব্যক্তি। মহানবী (সা.) হযরত আবুল ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি হযরত আব্বাসকে কিভাবে বন্দি করলেবা কিভাবে গ্রেপ্তার করলে? তুমি অত্যন্ত শীর্ণ-ক্ষীণ আর তিনি হলেন দীর্ঘকায় এবং বিশালদেহী। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এক ব্যক্তি আমার সাহায্য করেছিল যাকে আমি পূর্বে কখনো দেখিনি আর পরেও কখনো তাকে চোখে পড়ে নি। আর তার অবয়ব ছিল এরকম এরকম অর্থাৎ তার চেহারার বিবরণ দেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'লাকাদ আআনাকা আলাইহে মালাকুন কারীম'। অর্থাৎ এক সম্মানিত ফেরেশতা তোমাকে সাহায্য করেছে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) বলেন, যে শত্রুকে হত্যা করবে তার জন্য অমুক অমুক জিনিস থাকবে। অতএব মুসলমানরা ৭০জন মুশরেককে হত্যা করে আর ৭০জনকে

ইমামের বাণী

" আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথাসময়ে মানুষের সংস্কারের জন্য পাঠানো হয়েছে, যাতে ধর্মকে সজীবভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।"

(ফতেহ ইসলাম, পৃ:৭)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

বন্দি করে। হযরত আবুল ইয়াসার দুজন বন্দিকে নিয়ে আসেন আর বলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যে কেউ কাউকে হত্যা করবে, তার জন্য অমুক অমুক জিনিস থাকবে আর যে কাউকে বন্দি করবে, তার জন্য অমুক জিনিস থাকবে। আমি দুজন বন্দি নিয়ে এসেছি।

(আল মুসান্নিফ লি আব্দুল রাজ্জাক, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৩৯)

এক বর্ণনা অনুসারে বদরের যুদ্ধে হযরত আবুল ইয়াসারই আবুল বাখতারীর হত্যাকারী ছিলেন। (উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত সালামা বিনতে মাকেল বর্ণনা করেন যে, আমি হুবাব বিন আমর এর দাসী ছিলাম। তার ঔরসে আমার এক ছেলেও হয়েছিল। তার ইন্তেকালের পর তার স্ত্রী আমাকে বলে যে, তার ঋণের বিনিময়ে এখন তোমাকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। যেহেতু তিনি দাসী ছিলেন সেজন্য বলে যে, তোমাকে বিক্রি করে দেয়া হবে। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হই। পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করি। মহানবী (সা.) মানুষকে জিজ্ঞেস করেন যে, হুবাব বিন আমর এর ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির দায়দায়িত্ব কার ওপর? তখন জানানো হয় যে, তার ভাই আবুল ইয়াসার এর জন্য দায়ী। মহানবী (সা.)তাকে ডাকেন এবং বলেন যে, এই দাসীকে বিক্রি করো না, বরং তাকে মুক্ত করে দাও। আর আমার কাছে কোন দাস আসার সংবাদ পেলে তুমি আমার কাছে চলে এসো, এর বিনিময়ে আমি তোমাকে অন্য কোন দাস দান করব। (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৭২৬) অতএব এমনটিই হয়েছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) একে মুক্ত করে দিয়েছেন আর তাকে এক ক্রীতদাস প্রদান করেছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, উবাদা বিন ওয়ালীদ বলেন, আমরা একবার মহানবী (সা.) এর সাহাবী আবুল ইয়াসার এর সাথে দেখা করি। তখন তার সাথে তার এক ক্রীতদাসও ছিল। আমরা দেখলাম তার দেহে একটি ডোরাকাটা এবং একটি জামনী চাদর ছিল। একইভাবে তার দাসের শরীরেও একটি ডোরাকাটা ও একটি জামনী চাদর ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, চাচা আপনি কেনআপনার দাসের ডোরাকাটা চাদর নিজে নিয়ে নিজের চাদর তাকে দিয়ে দিলেন না বা তার জামনী চাদর নিজে নিয়ে নিজের ডোরাকাটা চাদর তাকে দিয়ে দিলেন না?এভাবে উভয়ের দেহে ভিন্ন রঙের কাপড় হতো। বর্ণনাকারী বলেন যে, হযরত আবুল ইয়াসার আমার মাথায় হাত বুলান এবং দোয়া করেন আর আমাকে বলেন যে, ভাতিজা! আমার এই দুই চোখ দেখেছে আর আমার এই দুই কান শুনেছে এবং আমার হৃদয় একে নিজের মাঝে স্থান দিয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলতেন, নিজেদের দাসদের সেই খাবারই খাওয়াও যা তোমরা নিজেরা খাও,আর সেই পোশাকই পরিধান করাও যা তোমরা নিজেরা পরিধান কর। অতএব কিয়ামত দিবসে আমার পুণ্যে কোন ঘাটতি আসার চেয়ে আমি ইহজাগতিক ধনসম্পদ হতে নিজের দাসকে সম পরিমাণ অংশ দেওয়া বেশি পছন্দ করব।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত সীরাত খাতামানন্নাবীঈন, পৃ: ৩৮৩)

এসব লোকের প্রতিই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হয়েছেন। যারা মহানবী (সা.) এর নির্দেশকে এতটা সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। আর খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সবসময় উদ্বেলিত থাকতেন, বরং তার সন্তুষ্টির ভিখারী ছিলেন।

হযরত আবুল ইয়াসার বর্ণনা করেন যে, বনু হারাম গোত্রের অমুক ব্যক্তির পুত্র অমুকের কাছে আমার সম্পত্তি পাওনা ছিল। অর্থাৎ তার আমাকে ঋণ ফেরত দেয়ার কথা। সে ঋণী ছিল আমার কাছে। আমি তার বাড়িতে যাই। সালাম করি, জিজ্ঞেস করি যে, সে কোথায়। ঘরে আছে কি? উত্তর আসে যে, না। তখন তার পুত্র, যে যৌবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছিল, তখনো সাবালক হয়নি, সে আমার কাছে আসে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, তোমার পিতা কোথায়। সে বলে যে, তিনি আপনার কণ্ঠ শুনে আমার মায়ের পালঙের নীচে ঢুকে পড়েছেন। অর্থাৎ আপনার কণ্ঠ শুনে পালঙের পেছনে লুকিয়েছেন। আমি পুনরায় ডাকি যে, বাইরে আস কেননা আমি জানি তুমি কোথায়। অর্থাৎ সেই ঋণী ব্যক্তিকে বা ঘরের মালিককে বলেন যে, আমি জানি তুমি কোথায়। আবুল ইয়াসার বলেন, সে বাহিরে আসে। আমি জিজ্ঞেস করি তুমি পালিয়েছিলে কেন? সে বলে, আমি আপনাকে বলছি,আর আমি মিথ্যা বলবো না। আমার ভয় হয় যে, আপনাকে বলার সময় মিথ্যা বলতে হবে আর ওয়াদা করে আবার ওয়াদা ভঙ্গ করতে হবে। আমি এসে আপনাকে বলবো যে, অমুক দিন অমুক সময় আপনার টাকা ফেরত দিব কিন্তু ওয়াদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হব! আরো বলে যে, আপনি তো মহানবী (সা.) এর সাহাবী, খোদার কসম, আমি অভাবী। তিনি বলেন যে, অর্থাৎ আবুল ইয়াসার বলেন, আমি বললাম, খোদার কসম? অর্থাৎ তাকে প্রশ্ন করি যে, তুমি কি সত্যিই আল্লাহ্‌র কসম খাচ্ছ। সে বলে যে, হ্যাঁ খোদার কসম। আমি বললাম খোদার কসম? অর্থাৎ আমি তাকে আবার জিজ্ঞেস করি যে, তুমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছো যে, তুমি অভাবী। সে বলে যে, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম। আমি তৃতীয়বার বললাম যে, আল্লাহ্‌র কসম? সে বলে, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম। আবুল ইয়াসার তখন ঋণ ফেরত দেয়ার চুক্তিপত্রটি নিয়ে আসেন আর নিজ হাতে সেটিকে মুছে ফেলেন। অর্থাৎ ঋণ ফেরত দেয়ার যে লিখিত চুক্তিপত্র ছিল তা মুছে ফেলেন এবং বলেন যে, যদি ফেরত দেয়ার সাধ্য হয় তাহলে ফেরত দিও নতুবা তুমি দায়মুক্ত। তিনি বলেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমার এই দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি, তখন তিনি উভয় আঙুল নিজের দুই চোখের ওপর রাখেন, আর আমার এই দুই কানের শ্রবণশক্তি, আর আমার হৃদয় এ কথা স্মরণ রেখেছে, আর এ কথা বলতে গিয়ে তিনি হৃদয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি মহানবী (সা.) কে দেখছি, অর্থাৎ যখন এই চুক্তি মুছে দেন আর তাকে দায়মুক্ত করেন তখন তিনি নিজের চোখ, কান এবং হৃদয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি যেন মহানবী (সা.) কে দেখছি যে, তিনি বলছিলেন, যে ব্যক্তি কোন অভাবীকে অবকাশ দেয় বা তার সমূহ আর্থিক বোঝা হালকা করে , আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুয যোহদ ওয়ার রাকায়েক, হাদীস- ৭৫১২)

অতএব আমি তোমার বোঝা হালকা করে দিয়েছি, কেননা আমি আল্লাহ্ তা'লার ছায়ার সন্ধানে আছি। এটি খোদাভীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত। তাদের একমাত্র বাসনা ছিল খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা, জাগতিক স্বার্থ লাভ করা নয়।

হযরত আবুল ইয়াসার কাব বিন আমর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতেন। একবার উবাদা বিন ওলীদের কাছে তিনি দুটি হাদীস বর্ণনা করেন আর চোখ এবং কানের ওপর হাত রেখে বলেন যে, এই চোখ এই ঘটনা দেখেছে আর এই কান মহানবী (সা.)কে এই কথা বলতে শুনেছে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুয যোহদ ওয়ার রাকায়েক, হাদীস- ৭৫১২-৭৫১৩)

এই ছিল তার সাবধানতার চিত্র। হযরত আবুল ইয়াসার-এর এক পুত্রের নাম ছিল উমায়ের, যিনি উম্মে আমরের ঔরসজাত। হযরত উম্মে আমর হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌র ফুফু ছিলেন। তার এক পুত্র ছিল ইয়াযিদ বিন আবি ইয়াসার যিনি লুবাবা বিনতে হারেসের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এক পুত্রের নাম ছিল হাবীব যার মা ছিলেন উম্মে ওয়ালাদ। এক মেয়ের নাম ছিল আয়েশা, যার মা ছিলেন উম্মে রওহা। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর। হযরত আমির মাবিয়ার যুগে ৫৫ হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয়।

এরাই ছিলেন সেসব মহান ব্যক্তিত্ব যারা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার পথও দেখিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লার ভীতির পন্থাও শিখিয়েছেন, আর মহানবী (সা.) এর নির্দেশাবলীকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে মান্য করে পূর্ণ আনুগত্য করার পন্থাও শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

****

আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি। (হুজরাত: ১৪)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

আল্লাহ্‌র বাণী

'এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করিও না, এবং এক অপরের পিছনে গীবত (কুৎসা) করিয়া বেড়াইও না।' (হুজরাত: ১৩)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

১২৪তম কাদিয়ান সালানা জলসার রিপোর্ট।

আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভালবাসার মর্যাদা পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না।
তাঁর প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুলের প্রেমে বিলীনতার প্রমাণ।
এই শেষদিনগুলিকেও দরুদে পরিপূর্ণ করে দিন এবং নতুন বছরকেও দরুদ ও সালাম দিয়ে স্বাগত জানান, যাতে আমরা অতিশীঘ্র সেই সমস্ত কল্যাণরাজি অর্জনকারী হই যা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে।

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টার ন্যাশনাল-এর মাধ্যমে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ।

আমি এই জনপদ অর্থাৎ কাদিয়ানে খোদা তা'লাকে দেখেছি। আমি ইসলামের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সা.)-এর প্রাণদাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সত্তায় পূর্ণ হতে দেখেছি। পৃথিবীতে মাহদীর দাবিদার অনেক রয়েছে। তারা নিজেদের তবলীগ প্রসারের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ব্যতিরেকে কারো একটি ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় নি। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি বেহিশতি মাকবারায় সমাহিত আছেন যাঁর ফলকে লেখা খোদিত আছে- 'মাযার মুবারক হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ ও মাহদী (আ.)। আমি আহমদীয়াতে বই পুস্তক অধ্যায়ন করেছি আর আহমদী মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। আহমদীরা অন্যান্য মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি সত্যবাদী এবং উৎকৃষ্ট মুসলমান। আমি জানি না আরও কত শতাব্দী অতিক্রান্ত হবে, যেদিন সমগ্র বিশ্বের সব থেকে উচ্চ নারা ধ্বনি কাদিয়ান থেকে উত্থিত হবে। ইনশাআল্লাহ॥

কাদিয়ানের জলসা সালনায় অংশগ্রহণকারী নওমোবাঈনদের ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া।

জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে যে প্রেমের বাণী প্রসার করছে তা প্রশংসনীয়। আমি হুযুর আনোয়ারকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই, যিনি সারা বিশ্বে প্রেমের বাণী প্রসার করছেন। আপনাদের জামাতের খলীফা সারা বিশ্বে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী প্রচার করছেন এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

মুসলিম সমাজ চিরকাল শিখধর্মের অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকেছে, তারা প্রত্যেক বিপদের সময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই দুটি ধর্মের বিশেষত্ব হল এরা এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করে।

পৃথিবীতে খুব কম জলসা এমন হয়ে থাকে যেখানে মানবতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। মানবতার সেবা সর্বাপেক্ষা মহান কাজ যা আপনার জামাত করছে। আজ যে উৎকৃষ্ট পন্থায় শান্তি ও ভালবাসার বাণী জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে তা প্রশংসনীয়।

জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের মতামত।

৪৮ টি দেশ থেকে ১৮,৮৬৪ জন অতিথির জলসায় অংশগ্রহণ। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণে লন্ডনে ৫, ৩৪৫ জন ব্যক্তি শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

**তাহাজ্জুদের নামায* কুরআনের দরস ও যিকরে ইলাহিতে পরিপূর্ণ পরিবেশ* উলেমাগণের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য* সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। * অতিথিদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া* দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় জলসার অনুষ্ঠানাদির সরাসারি অনুবাদ সম্প্রচার। * জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তরবীয়তি তথ্যচিত্র এবং বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ প্রদর্শনীর আয়োজন। * নিকাহসমূহের ঘোষণা* প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার সংবাদ প্রচার।*

রিপোর্ট : মনসুর আহমদ মসরূর

দ্বিতীয় দিন (দ্বিতীয় অধিবেশন) (৪র্থ পর্ব)

পরিচিতিমূলক বক্তব্য

মাননীয় হাফিয আব্দুল গনী সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা নাইজেরিয়া নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন- আমরা নয় জন ব্যক্তি ২৬ ডিসেম্বর নাইজেরিয়া থেকে যাত্রা করে ২৭ শে ডিসেম্বর কাদিয়ান পৌঁছেছি। আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার কাদিয়ান জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছি। প্রতিবার এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে গিয়েছি। কাদিয়ানে 'মাকামাতে মুকাদ্দসা' (পবিত্র নিদর্শনসমূহ) যেমন- মসজিদ আকসা, মসজিদ মুবারক, মিনারাতুল মসীহ, বেহিশতি মাকবারা, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর মাজার ইত্যাদি যিয়ারত করে এক অনন্য অনুভুতি সৃষ্টি হয়। আমার সঙ্গীরা প্রথমবার কাদিয়ান জলসায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করছে। তারা সকলে কাদিয়ান এসে আনন্দিত, আর এখানকার আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি থেকে উপকৃত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল খেদমতকারীদের প্রতিদান দিন। যদিও আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে দেখি নি, কিন্তু তাঁর খলীফাদেরকে আমরা দেখেছি, যাঁরা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল। ২০০৮ সালে নাইজেরিয়ায় যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) পদার্পণ করেন, তখন আমাদের এক মুয়াল্লিম সপরিবারে হযরত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন। হুযুর জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কোলের শিশুটির বয়স কত? তারা সেই শিশুটির বয়স বলতে না পারায় হুযুর আনোয়ার বলেন,আজকে আপনার এই শিশুটির বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়েছে। জলসার পর তিনি বাড়ি চলে যান। কোন কারণে ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে প্রয়োজন হয়। ছেলের জন্ম তারিখে দৃষ্টি পড়ামাত্র তার বিস্ময়ের সীমা ছিল না, কারণ যেদিন তিনি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, সেদিনই শিশুটির বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়েছিল। দোয়া করব যে, যে- উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এই জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আমরা যেন সেই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে পারি আর তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক অর্থে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখেন।

অধিবেশনের তৃতীয় বক্তব্য রাখেন হাফিয মুযাফ্ফর আহমদ সাহেব, নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ রাবোয়া। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল ' হযরত জাফর বিন আবি তালিব (রা.) এবং হযরত নাসের নওয়াব সাহেব (রা.)-এর জীবন চরিত।'

হযরত আলি (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর আহবানে একেবারে গোড়াতেই ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এরপর তাঁর বড় ভাই হযরত জাফর নিজের পিতার সমর্থনে রসুল করীম (সা.) ও ভাইয়ের সঙ্গ দিয়ে যখন প্রথম বার নামায পড়েন, তখন আঁ হযরত (সা.) তাঁকে 'যুল জানাহিন' ও তিয়ার' উপাধিতে ভূষিতে করে এই সুসংবাদ দান করেন যে,

এরপর শেষের পাতায়...

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আই.)- এর নির্দেশনাবলীর আলোকে

লাজনা ইমাউল্লাহ্গণের তরবিয়ত সংক্রান্ত দায়িত্বাবলী

মূল : বুশরা পাশা সাহেবা (সদর লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত)

অনুবাদ : জহিরুল হাসান সাহেব (ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ-

অর্থ : হে যাহারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, এবং তাঁর নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না এমতাবস্থায় যে, তোমরা (তাঁর আদেশ) শুনছো।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়া এবং উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী!

আল্লাহতা'লার এটি একটি অপার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে কোরআন করীম এর ন্যায় মহান পুরস্কার দান করেছেন। কোরআন করীমের মধ্যে আল্লাহতা'লা স্বীয় অনুশাসন অবতীর্ণ করে অদ্যবধি সেগুলি সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছেন। কোরআন করীমের নির্দেশাবলী প্রতিটা যুগের জন্য নির্ধারিত। অতঃপর আমাদের উপর আরও একটি অনুগ্রহ যে, এ যুগে আল্লাহতা'লা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে যুগের সংস্কারের নিমিত্তে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি (আঃ) কোরআন করীমের নির্দেশাবলীকে উন্মুক্ত করে আমাদের দৃষ্টিপটে রেখেছেন এবং খেলাফতে আহ্মদীয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে একাধারে যেমন আমাদেরকে আল্লাহ্ ও তার রসূল (সাঃ)-এর নির্দেশাবলীর উপর আমল করার এবং তাঁকে অনুকরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা-পত্র গড়েছেন সেখানে এটি বলে দিয়েছেন যে, খেলাফতের পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী হিসাবে চিরস্থায়ী খেলাফতের আশিষ থেকে সদা কল্যাণ মণ্ডিত হতে থাকবে।

আলহামদুলিল্লাহ॥ আল্লাহতা'লার স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা খেলাফতে আহ্মদীয়ার আশিষ থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হয়ে চলেছি। আর পঞ্চম খেলাফতের বরকতময় যুগে আমরা অবস্থান করছি। আমাদের প্রিয় নেতা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আই.) তাঁর প্রদত্ত খোতবা ও ভাষণ সমূহ আর বার্তার মাধ্যমে কোরআন করমের নির্দেশাবলীর উপর আমল করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন। তাঁর প্রতিটা নির্দের্শের উপর আমল করা আমাদের উপর খুব বড় একটা দায়িত্ব। যুগ খীলফার সঙ্গে আমরা আমাদের সম্পর্ক যত দৃঢ় করব তাঁর নির্দেশকে যত মান্য করব ততটাই কল্যাণের অধিকারী সাব্যস্ত হব।

এখন আমি আপনাদের সামনে হুজুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে লাজনা ইমাউল্লাহর তরবিয়তী দায়িত্বাবলীর উপর আলোকপাত করব।

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী !

আমরা লাজনা ইমাউল্লাহর সদস্য। আমাদের দাবি হল আল্লাহতা'লার দাবি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের উপর খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। একজন মাহিলার উপর এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, তার আমল যেন সঠিক হয়, যা খোদাভীতি ছাড়া অর্জন হতে পরে না। সেখানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সন্তানদের সঠিকভাবে তরবিয়ত করা। এছাড়া স্ত্রী রূপে একজন মহিলা তার স্বামীর গৃহের নেগরান হয়ে থাকে। এবং সমাজে পুণ্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও একজন আহ্মদী মহিলার উপর অর্পিত।

হযরত আকদাস,মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"কোরআন, শরীফের সমস্ত নির্দেশাবলী তাকওয়া ও পরহেযগারীর জন্য বিশেষ তাগিদ বিদ্যমান। এর কারণ এটাই যে, তাকওয়া সব ধরনের অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা প্রদান করে এবং সব ধরনের পুণ্য কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।" (পয়গাম, সালানা ইজতেমা লাজনা ২০০৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের কর্ম সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : .

"নিজেরা পুণ্যবান হও আপন সন্তানদের জন্য নেকী ও খোদভীরুতার একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ হয়ে দেখাও, তাদেরকে ধার্মিক ও খোদাভীরু করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা ও দোয়া করতে থকো। তাদের জন্য ধন-সম্পদ সঞ্চয় করতে যে প্রচেষ্টা করো সেই রকম প্রচেষ্টা এই বিষয়ে করো । .....সুতরাং সেই কাজ করো যা সন্তানদের জন্য উৎকৃষ্ট নমুনা ও শিক্ষনীয় হয়। আর এর জন্য সবচেয়ে জরুরী হল সর্ব প্রথম নিজের সংশোধন করো। যদি তোমরা উৎকৃষ্ট মানের খোদাভীরু ও পুণ্যবান হয়ে যাও আর খোদাতা'লাকে রাজী করাতে সক্ষম হও তবে নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্তা'লা তোমাদের সন্তানদের সাথেও উত্তম ব্যবহার করবেন। ..... সুতরাং এই উদ্দেশ্যকে লাভ করো। সন্তানদের জন্য তাদের হিতাকাঙ্খী হয়ে যাও।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৪৪-৪৪৫)

খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আই.) আমাদের ধর্ম সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :

সুতরাং মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক রূপ-লাবন্য খোদাভীরুতার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অর্থে অগ্রসর হওয়ার সাথে নিহিত। এজন্য নিজেদের দিনগুলিকে আল্লাহর ভয়ে সুশোভিত করো আর রাতগুলিকে তাকওয়ার দ্বারা রঙ্গীন করে তোলো। শরীয়তের মর্মার্থই হল তাকওয়া।"

(পয়গাম সালানা ইজতেমা লাজনা ইমাউল্লাহ্ ২০০৪)

হুজুর আরও বলেন,

"আপনারা আহমদী মহিলা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে মান্য করার সৌজন্যে সমাজে আপনাদের একটা বিশেষ মর্যাদা বিদ্যমান। ..... এদৃষ্টিকোণ থেকে সর্ব প্রথম আপনাদের জীবনকে তাকওয়ার জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করতে হবে। তবেই আপনাদের সন্তানরা তরবিয়তপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের জন্য কল্যাণকারী সাব্যস্ত হবে।" (পয়গাম সালানা ইজতেমা ২০০৪)

হুজুর বলেন,

"যে সমস্ত পরিবারের মায়েরা পুণ্যবতী, নামাজ নিষ্ঠার সাথে পাঠকারী, জামাতীয় ব্যবস্থাপনাকে মান্যকারী, এজলাস ও ইজতেমাগুলিতে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী, সব ধরনের তরবিয়তি প্রোগ্রামগুলিতে ব্যক্তিগত কাজকে উপেক্ষা করে অংশগ্রহণকারী, নিজ সন্তানদের জন্য দোয়াকারী সেক্ষেত্রে এরকম পরিবারের সন্তানরা সাধারণত ধার্মিক হয়ে থাকে। আর পিতা-মাতার বাধ্য হয়ে থাকে। এজন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় জিনিষ হল পিতা-মাতা স্বয়ং যেন তাদের সন্তানদের জন্য আদর্শ হয়ে ওঠে।"

(ভাষণ জলসা সালানা বারতানিয়া ২০০৩)

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী!

এরপর আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সন্তানদের সঠিকভাবে তরবিয়ত করা। সন্তানদের জন্মের পূর্বেই আল্লাহতা'লা দোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

(সূরা আলে ইমরান : ৩৯)

অর্থ : হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর।

দোয়ার পর্যায়ক্রম যা মূলত সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পূর্বেই শুরু হয়ে যায় তা পরবর্তীতে অব্যাহত থাকে। এজন্য আল্লাহ্তা'লা এ দোয়া শিখিয়েছেন :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

(সূরা ফুরকান : ৭৫)

অর্থ : হে আমার প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান করএবং আমাদেরকে মুত্তাকি গণের ইমাম বানাও।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন :

"আমার এমন অবস্থা যে, আমার কোন নামাজ এমন নয় যেখানে আমি আমার বন্ধুদের, সাথীদের, সন্তানদের এবং আমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করি না।" (মালফুযাত প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৬২-৫৬৩)

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইঃ) বলেন,

তরবিয়তে বরকত তখনই লাভ হয় যখন তার সাথে দোয়াও অন্তর্গত হয়। আর মাদেয়েদের দেখে সন্তানদের মনেও দোয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং কেবল বাহ্যিক তরবিয়তই নয় একজন মায়ের দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহতা'লার সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত।"

(লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ জলসা সালানা বারতানিয়া ২০১৭)

তিনি আরও বলেন,

"শৈশব থেকেই আল্লাহ্তালার প্রতি ভালোবাসা হৃদয়ে তৈরী করুন। যখন একটু বুঝতে শেখে তখন যাই তাকে দিন না কেন, তাকে বলুন যে, এটা তোমাকে আল্লাহ্তা'লা দান করেছেন। ..... ধন্যবাদ জানানোর অভ্যাস তৈরী করে দিন তারপর একটু একটু করে বোঝান যে, কোন কিছুর

প্রয়োজন হলে তা আল্লাহ্‌মিঁয়ার কাছে চাইতে হয়। এর পর নামাজের অভ্যাসও ছোটবেলা থেকে তৈরী করা উচিত।" (জলসা সালানা বারতানিয়া ২০০৩)

তিনি আরও বলেন,

"সবসময় বাচ্চাদের নেক, ধর্মভীরু হওয়ার জন্য দোয়া করতে থাকা উচিত। কেননা সন্তানদের উদ্দেশ্যে পিতা-মাতার দোয়া পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহতা'লা এটাই আমাদের শিখিয়েছেন ও উপদেশ প্রদান করেছেন। ..... অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের অবাধ্যতার উল্লেখ করে চিঠিতে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার যা দায়িত্ব ও সর্বাধিক কর্তব্য তা হল জন্ম থেকে শুরু করে শেষ নিঃশ্বাস অবধি সন্তানদের পুণ্যবান ও সুস্বভাবের জন্য দোয়া করতে থাকুন। আর তাদের বৈধ ও অবৈধ কথাকে সব সময় সমর্থন না করুন। সন্তানদের তরবিয়ত ও মানুষ শুধু এই উদ্দেশ্যে করবেন না যে, তারা আমাদের ধন-সম্পত্তির মালিক হবে।" (জলসা সালানা বারতানিয়া ২০০৪)

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী !

সন্তানদের তরবিয়তের জন্য সবচেয়ে প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ হল তাদেরকে নামাজে অভ্যস্ত করে তোলা।

মায়েদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুজুর বলেন,

"বাড়িতে নিজেরাও কোরআন পাঠ করার রেওয়াজ তৈরী করুন। আর ছেলে-মেয়েদেরও তেলাওয়াত করার উপদেশ প্রদান করুন। যারা পড়তে পারে না তাদেরকে শেখানোর এবং তরজমার ক্লাস পরিচালনা করুন।"

(পয়গাম সালানা ইজতেমা ২০০৬)

আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন :

"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নিজে কোরআন শেখে এবং অপরকে শেখায়।" কোরআন মজীদ শেখার ব্যবস্থাপনাকে সুসংবদ্ধ করা দরকার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"এমন লাজনা যারা নাজেরা কোরআন জানে তারা অনুবাদ শিখুন। আপন আপন গণ্ডীতে সন্তানদের কোরআন করীমের শিক্ষা দান করুন। একই রকম ভাবে কোরআন করীম পাঠ করার ব্যাপারেও বিশেষ উদ্যোগ নিন। আল্লাহতা'লা কোরআন করীমে বলেছেন যে ফজরের (সময়) তেলাওয়াতকে বেশি প্রাধান্য দিন। নিশ্চিতভাবে ফজরের কোরআন পাঠ এমনই যে এর সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। (পয়গাম সালানা ইজতেমা ২০১৪)

তিনি আরও বলেন,

"যখন আপনারা কোরআন করীমের শিক্ষার ব্যাপারে অবগত হবেন তখন এখন সব যুক্তি প্রমাণ সম্পর্কেও আপনারা জ্ঞানলাভ করবেন যার দ্বারা অপরকে ইসলামের সৌন্দর্য বর্দ্ধক শিক্ষার পরিচয় তুলে ধরার উৎসাহ ও শক্তি আমাদের হৃদয়ে তৈরী হবে।" (পয়গাম সালানা ইজতেমা ২০১৪)

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী!

আল্লাহ্‌তা'লার আশিষ ও জামাতের কল্যাণে আমরা একটি ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত রয়েছি যেখানে জামাতের প্রত্যেক সদস্যের জন্য তরবিয়তের ব্যবস্থা বিদ্যমান। আমাদের এটি দায়িত্ব যে, স্বয়ং নিজেরোও আর সন্তানদের হৃদয়েও ব্যবস্থাপনার প্রতি সম্মান তৈরী করি। জামাতীয় ও সাংগঠনিক স্তরে হওয়া প্রোগ্রামগুলিতে নিজেরাও যেন অংশগ্রহণ করি আরও সন্তানদেরও যেন ব্যবস্থাপনা ও মিশনের সঙ্গে যুক্ত রাখি।

হুজুর বলেন,

"অনেক পরে জামাতীয় ব্যবস্থাপনা অথবা জামাতের কর্ম কর্তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে কিংবা অযথা সমালোচনা করার অভ্যাস হয়ে থাকে। এর ফলে বাচ্চাদের মনেও খারাপ ধারণা তৈরী হয়। আর যখন খারাপ প্রভাব পড়ে তখন সে জামাত থেকে দূরে সরে যায়। .....বাচ্চাদের সামনে কখনও (সমালোচনামূলক) কথা বলাই উচিৎ নয়। সুতরাং এটা খুব বড় একটা দায়িত্ব যা মো'মেনা নারীদের উপর অর্পিত হয়েছে। .....তারা ঘরের তরবিয়তের জন্যও দায়িত্ব প্রাপ্ত.....সমাজের তরবিয়তের জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১)

হুজুর বলেন,

"অনেক মায়েরা নিজেদের সন্তানকে এজলাসগুলিতে এই জন্যই পাঠাতে চায় না যে, সেখানে অন্যান্য বাচ্চাদের কাছে থেকে অশ্লীল কথা ও অবাধ্যতা শিখে যাবে। এটা তো জানা নেই যে, তারা অবাধ্যতা কিংবা অসভ্য কথা শেখে কিনা কিন্তু অভিজ্ঞতার কথা বলছে যে, এ রকম সন্তানরা বড় হয়ে ধর্ম থেকে বিমুখ হতে দেখা গেছে। শেষ অবধি তারা পিতা-মাতারও কোন কাজে আসে না। এজন্য ভুল পরিবেশ থেকে বাঁচানোর জন্য সন্তানদেরকে জামাতীয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত রাখুন।" (জলসা সালানা বারতানিয়া ২০০৩)

তিনি আরও বলেন,

"পার্থিব শিক্ষার সাথে সাথে বাচ্চাদের মসজিদের সাথে, নেযামের সাথেও সম্পর্ক তৈরী করে দিন, যাতে ভালো পরিবেশ লাভ হয়। এমন পরিবেশ যা খোদা ও খোদার রসূলের প্রতি ভালোবাসা হৃদয়ে সংস্থাপিত করে, উন্নত চরিত্রদানকারী হয়।" (জলসা সালানা বারতানিয়া ২০০৩)

এরপর খেলাফতে আহমদীয়ার যে মহান সম্পদ আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন নিজেরাও এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও এই কল্যাণময় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার গুরুদায়িত্বও আহমদী মায়েদের উপর বর্তায়। আল্লাহর এই রজ্জুকে সুরক্ষা প্রদানই হতে পারে আমাদের আগামী প্রজন্মের সুরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা স্বরূপ।

হুজুর বলেন,

"সব কল্যাণ খেলাফতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপনি যুগ যুগ খলিফার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক যতটা দৃঢ় করবেন ততটাই কল্যাণের উত্তরাধিকারী গণ্য হবেন। এবং নিজেরাও খেলাফতের মঙ্গে সংযুক্ত থাকুন আর নিজের সন্তানদেরকেও এর উপদেশ প্রদান করতে থাকুন।" (পয়গাম সালানা ইজতেমা ২০০৭)

তিনি আরও বলেন,

খেলাফতের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরী করার জন্য নিজেদের বাড়িতেও খেলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকুন। এটা আপনাদের সন্তান তরবিয়তের কাজ সহজসাধ্য করে তুলবে। আপনিও এতে গর্বিত হবেন আর জামাতও। যদি আপনারা আন্তরিকভাবে এ দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা করেন তবে স্মরণ রাখবেন এটা আপনাদের জন্য একটি 'জারি সাদকা' স্বরূপ হবে। যার উপর আগামী প্রজন্মও গর্ব করবে। আর এর ফলে আপনাদের জন্য তারা প্রার্থনাও করবে। আর আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে পাওয়া পুরস্কার এটা ব্যতিরকে হবে। ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহতা'লা আপনাদেরকে এর সৌভাগ্য প্রদান করুন। আমিন। (পয়গাম সালানা ইজতেমা লাজনা ২০০৯)

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী!

খেলাফতে আহ্‌মদীয়ার সাথে নিজেদের সম্পর্ককে দৃঢ় করার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল এম. টি. এ আল্লাহতা'লা এ এক রুহানী খাদ্য আমাদেরকে দান করেছেন। নিজ সন্তানদেরকে এই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংযুক্ত করার দায়িত্ব মায়েদের।

হুজুর বলেন, লাজনা ইমাউল্লাহর প্রত্যেক সদস্যের এটি দায়িত্ব যে, তারা যেন এম. টি. এ.-র সঙ্গে নিজেদের জুড়ে দেয়। আর নিয়মিত এর অনুষ্ঠান দেখে। কমপক্ষে এটা যেন নিশ্চিত করে যে, আমরা খুতবা জুমআ এবং যুগখলিফার অপরাপর প্রোগ্রামগুলি অবশ্যই দেখবে। আর এটাও যে, তাদের সন্তানরাও বসে এসব প্রোগ্রাম যেন দেখে। কেননা এসব তাদের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার কারণও হবে আর তাদের ধর্মীয় জ্ঞানও প্রসারিত হবে।" (পয়গাম ন্যাশনাল ইজতেমা ইউ. কে. ২০১৫)

বর্তমান যুগকে খুবই উন্নতশীল যুগ বলা হচ্ছে। শালীনতার সমস্ত পর্যায়কে পিষ্ট করা হচ্ছে। চারিত্রিক অশ্লীলতার বাতাবরণ বিরাজমান। এ-রকম দূর্বিষহ অবস্থায় পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করা হচ্ছে। পর্দা সম্পর্কে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা কী আমাদের মেয়েদের বলা উচিত। তাদের মনে এটা ঢোকানো দরকার যে, পৃথিবীর অন্য সাধারণ আর পাঁচজনের মত আমরা স্বাধীন নই। বরং আমরা ইসলামী ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত যা খেলাফতের অধীনে প্রতিষ্ঠিত। কেননা ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজে এক সঙ্গে পড়াশোনা করে। অনেক সময় প্রয়োজন সাপেক্ষে সহপাঠীদের সঙ্গে কথাও বলতে হয়। মেয়েরা যদি পর্দার সীমা সম্পর্কে অবগত হয় তবে কখনই তারা সীমা লঙ্ঘন করবে না। বরং তাদের মনে একটা ভীতি থাকবে। (ক্রমশ:....)

যুগ ইমামের বাণী

খোদা নূতন জগৎ ও নূতন আকাশ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সেই নূতন আকাশ ও নূতন জগৎ কি? নূতন জগৎ সেই পবিত্র হৃদয় যাহা খোদা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা খোদা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহার দ্বারা খোদা প্রকাশিত হইবেন। (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৩৩)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 28 Feb, 2019 Issue No.9

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১ম পাতার শেষাংশ.....

চাইল। তারা যাবতীয় প্রকারের আমোদ-প্রমোদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের সামগ্রী, এমনকি সব থেকে রূপসী মহিলাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিল। আর এই সব কিছু ছিল একটি মাত্র শর্তের বিনিময়ে, সেই শর্ত ছিল, 'তুমি আমাদের প্রতিমাসমূহের নিন্দা করা থেকে বিরত হও। কিন্তু তিনি (সা.) তায়েফে বিপদের মূহুর্তে যেমন নির্বিকার ছিলেন, এখন বাদশাহ্ হওয়ার প্রতিশ্রুতি লাভের পরও এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম হল না, বরং তিনি পাথর দ্বারা প্রহৃত হওয়াকেই শ্রেয় জ্ঞান করলেন। অতএব, আঁ হযরত (সা.) যদি না এর মধ্যে এক নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করতেন, তবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে দুঃখ কষ্ট সহ্য করার তাঁর প্রয়োজন কি ছিল?

আমাদের নবী (তাঁর উপর শান্তি ও অভিনন্দন বর্ষিত হোক) অন্য কোন নবী এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন নি, যেখানে নবুয়তের কাজ থেকে বিরত থাকার বিনিময়ে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মসীহকেও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় নি। পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল আঁ হযরত (সা.)-কেই স্বীয় কর্তব্য থেকে নিরস্ত হতে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতএব এই সম্মান আমাদের নবী (সা.)-এর সঙ্গে বিশিষ্ট। অনুরূপে, আমাদের পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক নবী (সা.) দুঃখ-কষ্ট এবং বিজয়- উভয় যুগের অভিজ্ঞতাই লাভ করেছেন। এইরূপে তিনি (সা.) উভয় ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

মুত্তাকিরা যেন এই উভয় প্রকারের আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করে, এটিই আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়। কখনও জাগতিক আনন্দ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য রূপে তারা এই অভিজ্ঞতা লাভ করে, আবার কখনও কষ্ট, কাঠিন্য ও বিপদাপদের মধ্য দিয়ে, যাতে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর দুটি দিকই পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। কিছু চারিত্রিক গুণাবলী ক্ষমতালাভের পর প্রকাশ্যে আসে, আর কিছু প্রকাশ পায় দুঃখ-কষ্ট ও সংকটের যুগে। আমাদের নবী (সা.) উভয় অভিজ্ঞতারই সম্মুখীন হয়েছেন। অতএব, আমরা মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলীর এতবেশি বৈচিত্র্য তুলে ধরতে পারব, তা অন্য কোন জাতির তাদের কোন নবীর ক্ষেত্রে তেমনটি করতে সক্ষম নয়। যেমন-মসীহ-এর দ্বারা কেবল ধৈর্য প্রদর্শিত হতেই দেখা গেছে। তিনি দিনের পর দিন নির্মমভাবে প্রহৃত হয়েছেন। কিন্তু একথা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তিনি ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তিনি যে সত্য নবী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি যাবতীয় প্রকারের নৈতিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যেহেতু কুরআনের তাঁর কথা উল্লেখ হয়েছে, অতএব, আমরা তাঁকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করি। তাছাড়া, কেবল ইঞ্জিলের দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি এমন কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন যা নবীদের মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া নবীদের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে, আমাদের পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক নবী (সা.) প্রারম্ভিক ১৩ বছরের দুঃখ কষ্টের সময় যদি মৃত্যু বরণ করতেন, তবে মসীহর ন্যায় তাঁর অনেক উৎকৃষ্ট মানের চারিত্রিক গুণাবলী অপ্রকাশিত থেকে যেত। কিন্তু যখন বিজয়ের দ্বিতীয় যুগ এল, আর অত্যাচারী ও অপরাধীদেরকে মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হল, তখন তাঁর ক্ষমা ও করুণার পূর্ণ বিকাশের প্রমাণ পাওয়া গেল। এর থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর এই কাজ পরিস্থিতি উদ্ভুত কোনও প্রকার চাপ ও বলপ্রয়োগের পরিণাম ছিল না। বরং তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সমস্ত কিছু করেছেন। এছাড়াও মহানবী (সা.)-এর আরও অনেক নৈতিক গুণাবলীও প্রমাণসিদ্ধ। তাই আল্লাহ্ তা'লা যে এখানে বলেছেন,

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

(হা-মিম সিজদা: ৩২) অর্থাৎ আমরা

৯এর পাতার পর..

আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে দুটি ডানা দান করেছেন যেগুলির সাহায্যে আপনি জান্নাতে পাখা মেলে উড়বেন।

(আল আকমালু ফি আসমাউর রিজাল, শেখ ওলীউদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ্ খতীব, পৃ: ১৭০)

হযরত জাফরও (রা.) রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে অন্যান্য অত্যাচারিত মুসলমানদের সঙ্গে ইথিওপিয়ার ন্যায়পরায়ণ খৃষ্টান সম্রাটের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রসুলুল্লাহ (সা.) -এর মদিনা হিজরতের পর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটলে হযরত জাফর মদিনায় দ্বিতীয় হিজরত করার সৌভাগ্য পান। ৬ হিজরীতে হযরত জাফরের সঙ্গে ইথিওপিয়ার মুহাজিরগণ খায়বার যুদ্ধে বিজয়লাভের অব্যহিত পরেই মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে মিলিত হন। ১৪ বছর পর নিজের ভাইদের স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের সময় রসুল করীম (সা.) স্বয়ং এগিয়ে এসে হযরত জাফরকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হন। তিনি (সা.) তাঁর কপালে স্নেহের চুম্বন দেন। এরপর তিনি বলেন, 'আজ আমি এতটাই আনন্দিত যে, খায়বার জয়ের আনন্দ বেশি না জাফর ও তার সঙ্গীদেরকে পাওয়ার আনন্দ বেশি তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

(ইবনে সাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২৩)

তোমাদের বন্ধু- ইহজীবনেও এবং পরজীবনেও। অতএব, এই আয়াত সেই সমস্ত নির্বোধদের এই মতবাদকে খণ্ডন করে, যারা ইহজগতে ফিরিশতার অবতরণকে অস্বীকার করেছে। ফিরিশতার যদি কেবল মৃত্যুশয্যাতেই অবতীর্ণ হয়, তবে **'হায়াতুদ দুনিয়ায়'** বা ইহজগতে খোদা তা'লা কিভাবে বন্ধু হলেন?

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২-৩)

(ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম,

হযরত আলি বর্ণনা করেন, সেই সময় থেকে আঁ হযরত (সা.) হযরত জাফরকে তাঁর বিশেষ উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য করে নেন। ইথিওপিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সেখানকার সম্রাট ও শাসক বসরার বাদশার প্রতি প্রেরিত মুসলমান দূতকে হত্যা করিয়ে দেয়। এটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা ছিল। প্রত্যাঘাতের জন্য নবী করীম (সা.) তিন হাজার ইসলামী সৈন্য প্রস্তুত করেন। একাধিক সম্ভ্রান্ত বংশের সাহাবা থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) নিজের মুক্ত ক্রীতাদাস যায়েদ (রা.) কে যে সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং হযরত জাফরকে তাঁর সহ-সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। এবং বলেন, যায়েদ বিন হারিসা শহীদ হয়ে গেলে, সেনাপতি হবে জাফর এবং তাঁর পর রাওয়াহা। হযরত জাফর এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

ইসলামের সেনাপতিদের শাহাদতের সংবাদ দিয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন- হে লোক সকল! একটি অত্যন্ত বেদনায়দায়ক সংবাদ রয়েছে। মোতার যুদ্ধে মুসলমানেরা শত্রুদের সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

(ক্রমশ:.....)

আল্লাহ্‌র বাণী

" হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার কর, কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ।" (হুজরাত : ১২)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

আল্লাহ্‌র বাণী

"নিশ্চয় মোমেনগণ পরস্পর ভাইভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর। (হুজরাত: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir